সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ : লেখকের লেখক

পথিকৃৎ ডেস্ক

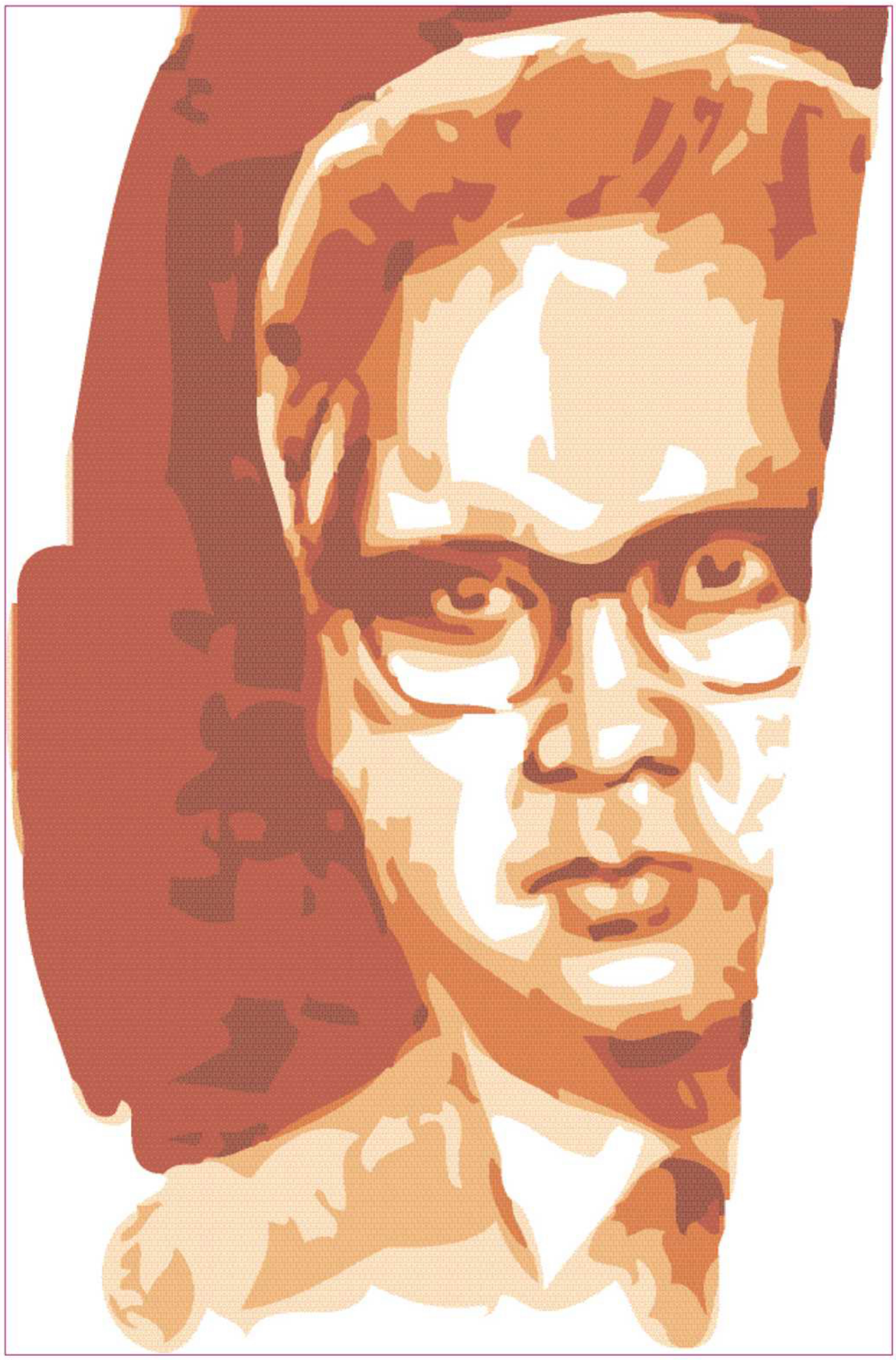

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর বাবা ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের চাকুরে। সেইসময় ব্রিটিশ ভারতের কোনো সরকারি চাকুরেকে ইংরেজ সাম্রাজ্যের আত্মপক্ষ বলেই বিবেচনা করা হতো। মহকুমা কিংবা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাই যেমন পারতেন না অনায়াসে সাধারণ জনগণের সঙ্গে মিশতে, তেমনি তাঁর ছেলেমেয়েরাও একটি সুনির্দিষ্ট গণ্ডি অতিক্রম করতে পারতেন না। সাধারণ ছেলেমেয়েদের সাথে তাঁদের ছেলেমেয়েদের মেশার কোনো সুযোগ ছিল না। সরকারি নীতিমালার দ্বারাই তাঁদের জীবন, আচরণ, কার্মকাণ্ড ও চলাচলের সীমা নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত হতো। ফলে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর সহপাঠী বন্ধুদের সঙ্গে মিশতে পারতেন না। যার কারণে তাঁর জীবন হয়ে পড়ে খুব একাকী ও নিঃসঙ্গ। আর এই একাকী জীবনের নিঃসঙ্গতা ঘোচাতে তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়ে ওঠে বই। বইকেই তিনি পরম বন্ধু মনে করেন এবং বইয়ের সঙ্গেই তিনি তাঁর অধিকাংশ সময় কাটান। আর এই পরম বন্ধুটির সঙ্গে থাকতে থাকতে তিনি একসময় শুরু করেন লেখালেখি এবং হয়ে ওঠেন এদেশের সুনামধন্য সাহিত্যিক।

১৯২২ সালের ১৫ জুন চট্টগ্রাম শহরের নিকটবর্তী ষোলশহরের এক মুসলিম পরিবারে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ জন্মগ্রহণ করেন। ওয়ালীউল্লাহর বাবা-মা'র পরিবার ছিল পূর্ববাংলার উচ্চশিক্ষিত, সংস্কৃতিবান ও অভিজাত পরিবারগুলোর একটি। ওয়ালীউল্লাহ্র বাবা সৈয়দ আহমদউল্লাহ ছিলেন একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা। তিনি ছিলেন সাহসী, সরল এবং স্পষ্টভাষী। ১৯১২ সালে তিনি চট্টগ্রাম কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আইএ পাস করেন এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে যোগ দিয়ে সরাসরি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। তিনি এসডিও হিসেবে বিভিন্ন মহকুমায় কর্তব্য পালন করেন। তিনি বর্ধমানের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক হিসেবে ১৯৪৪ সালে পদোন্নতি লাভ করেন এবং ১৯৪৫ সালে একই পদে ময়মনসিংহে বদলি হন। তিনি যখন ময়মনসিংহের এডিএম ছিলেন তখন অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং চিকিৎসার জন্য কলকাতা যান এবং সেখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

১৯৩০ সালে ওয়ালীউল্লাহ্র বয়স যখন ৮ বছর তখন তাঁর মা মারা যান। তাঁর বাবা দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন। বিমাতার সাথে ওয়ালীউল্লাহ্র সম্পর্ক ছিল খুবই নিবিড়। তাঁর বাবা মৃত্যুর সময় তেমন কোনো সম্পদ রেখে যেতে পারেননি। তাই বাবার মৃত্যুতে ওয়ালীউল্লাহ্র পড়াশোনার ক্ষতি হয় এবং জীবনে অনেক বাধা-বিপত্তি আসে। বাবার মৃত্যুর পর সংসার চালানোর ভার এসে পড়ে তাঁর বড় ভাই নসরুল্লাহ ও ওয়ালীউল্লাহ্র ওপর এবং তাঁর পড়াশোনায় সমাপ্তি টানতে হয়।

সরকারি পদস্থ কর্মকর্তার সন্তান হিসেবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র শিক্ষাজীবন কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকেনি। তাই ওয়ালীউল্লাহ্র শিক্ষাজীবন কেটেছে তৎকালীন পূর্ববাংলা ও বর্তমান বাংলাদেশের নানা প্রান্তে। পিতার কর্মস্থল পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তন ঘটেছে তাঁর স্কুলের। তাঁর স্কুলগুলো ছিল মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, ফেনী, ঢাকা, কৃষ্ণনগর, কুড়িগ্রাম, চিনসুরা, হুগলী, সাতক্ষীরা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জায়গায়। বিভিন্ন স্কুল ঘুরে ১৯৩৯ সালে কুড়িগ্রাম হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৯৪১ সালে ঢাকা কলেজ থেকে আইএ পাস করেন ওয়ালীউল্লাহ্। ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজ থেকে ১৯৪৩ সালে ডিসটিংশনসহ বিএ পাস করেন। তখন ওয়ালীউল্লাহ্র পিতা ময়মনসিংহের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। কিছুদিন পড়েছেন কৃষ্ণনগর কলেজেও। বিএ পাস করে তিনি কলকাতায় যান এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ অর্থনীতিতে ভর্তি হন। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর তাঁর পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৪৫ সালে তাঁর মামা খান সিরাজুল ইসলামের সহায়তায় ওয়ালীউল্লাহ্ কমরেড পাবলিশার্স নামে একটি প্রকাশনাসংস্থা চালু করেন। সে বছরই ইংরেজি দৈনিক 'Statesman' পত্রিকায় সাব-এডিটর হিসেবে সাংবাদিকতার মাধ্যমে পেশাজগতে প্রবেশ করেন। তারপর ১৯৪৭ সালে আগস্টে পত্রিকার চাকরি ছেড়ে দিয়ে রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্রের সহকারী বার্তা সম্পাদক হয়ে ঢাকায় আসেন। এর আগে তাঁর প্রথম কর্মস্থল ছিল কলকাতায়। ১৯৫১ সালে দিল্লিতে পাকিস্তানি মিশনে।

১৯৫২ সালে দিল্লি থেকে বদলি হয়ে চলে যান অস্ট্রেলিয়ায়। ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত দুই বছর অস্ট্রেলিয়ায় ছিলেন। তারপর আবার ঢাকার আঞ্চলিক তথ্য দপ্তরে। ১৯৫৫ সালে ওয়ালীউল্লাহ্ আবার করাচি তথ্য মন্ত্রণালয়ে বদলি হন। ১৯৫৬ সালের জানুয়ারি মাসে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার তথ্য পরিচালক রূপে জাকার্তায় প্রেরণ করা হয় তাঁকে। দেড় বছর তিনি সেখানে পরিচালক পদে ছিলেন। দেড় বছর পর তাঁর পদটি বিলুপ্ত হয়ে গেলে পাকিস্তান সরকারের দ্বিতীয় সেক্রেটারির পদমর্যাদায় ওয়ালীউল্লাহ্কে জাকার্তার দূতাবাসে প্রেস এটাচি হিসেবে নিয়োগ দেন।

১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত জাকার্তায়ই ছিলেন। সেখান থেকে পুনরায় করাচি আসেন। সেখানে ১৯৫৯ সালের মে মাস পর্যন্ত তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের ওএসডি (অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি) থাকার পর তাঁকে লন্ডনে অস্থায়ীভাবে প্রেস এটাচি হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। এই সময় তাঁর দায়িত্বকাল ছিল ১৯৫৯ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত। অক্টোবরেই আবার বদলি হয় তাঁর। এবার চলে যান পশ্চিম জার্মানির বন-এ। সেখানেই পদোন্নতি হয় তাঁর ফার্স্ট সেক্রেটারি পোস্টে। সেখানে ফার্স্ট সেক্রেটারির পদমর্যাদায় ছিলেন ১৯৬১ সালের মার্চ পর্যন্ত। এপ্রিলে চলে আসেন প্যারিসে। সেখানে ১৯৬৭ সালের আগস্টে ইউনেস্কোর প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট হিসেবে যোগদান করেন। এই পদে ছিলেন ১৯৭০ সালের শেষ দিন পর্যন্ত। তারপর তাঁর পদের মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে পাকিস্তান সরকার ওয়ালীউল্লাহ্কে ইসলামাবাদে বদলির প্রস্তাব করে, কিন্তু রাজি না হওয়ায় মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত চাকরি ছাড়া জীবন-যাপন করেন প্যারিসেই।

চাকরির কারণে ওয়ালীউল্লাহ্কে নানা দেশ ঘুরতে হয়েছে। তারপরও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র ছিল দেশভ্রমণের এক বিপুল নেশা। সময় ও সুযোগ পেলেই বেরিয়ে পড়তেন তিনি। বিশেষ করে তাঁর আগ্রহ ছিল হিস্পানি সভ্যতার দিকে। যে কারণে স্পেনে তিনি চাকরিসূত্রে বেশ কয়েকবার গেলেও বেড়াতেও গিয়েছেন আলাদা করে। এছাড়া চাকরিসূত্রে পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক শীর্ষস্থানীয় রাষ্ট্র তিনি ঘুরে দেখেছেন।

চাকরিসূত্রে যাওয়া ফ্রান্সেই ফরাসি দূতাবাসের কর্মকর্তা এ্যান মারির সাথে পরিচয় ঘটে ওয়ালীউল্লাহ্র। গড়ে ওঠে হৃদ্যতাও। বিয়ের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকলেও তিনি কূটনৈতিক হওয়ায় রাষ্ট্র তাঁকে বিদেশি নাগরিক বিয়ে করার অনুমতি দেয় না। তাই পুনরায় বদলি হতে হয় তাঁকে। করাচিতে তথ্যমন্ত্রণালয়ে বদলি হয়ে এলে এ্যান মারি তিবোও প্যারিস থেকে চলে আসে করাচি। সেখানেই ১৯৫৫ সালে তাঁদের বিয়ে হয় ইসলাম ধর্মমতে। এসময় ধর্মান্তরিত হন এ্যান মারি। তাঁর নাম রাখা হয় আজিজা মোসাম্মৎ নাসরিন। তবে ব্যক্তি এ্যান মারি ওই কাবিননামা পর্যন্তই মুসলিম ছিলেন। ধর্ম কোনো বড় বিষয় হতে পারেনি তাঁদের সংসারে। ব্যক্তিগতভাবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ছিলেন অসাম্প্রদায়িক। তাই ধর্মান্ধতাকে তিনি ঘৃণা করতেন চরমভাবে। নিজের সংসারের ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। সাংসারিক জীবনে ওয়ালীউল্লাহ্ ছিলেন দুই সন্তানের জনক। প্রথম সন্তান কন্যা—সিমিন ওয়ালীউল্লাহ্ এবং দ্বিতীয় সন্তান পুত্র—ইরাজ ওয়ালীউল্লাহ্। এ্যান মারি তিবোর মা-বাবার প্রকৃত বাড়ি প্যারিসে নয়। তাঁদের বসবাস ফ্রান্স এবং সুইজারল্যান্ডের সীমান্তবর্তী এলাকা গ্রিনোবেল-এ। সেই গ্রিনোবেলের ইউরিয়াজ নামক গ্রামেই লিখেছেন 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসটি।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ছিলেন অন্তর্মুখী, নিঃসঙ্গ এবং অতিমাত্রায় সলজ্জ ও সংকোচপরায়ণ। তিনি ধীরে ধীরে প্রায় অস্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলতেন, তবে খুব কম কথা বলতেন। কথার চেয়ে কাজ করার ঝোঁক ছিল বেশি। তাঁর চরিত্রে আভিজাত্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ব্যাপক অনুশীলন, অধ্যয়নস্পৃহা ও কল্পনাপ্রিয়তা। নানা বৈচিত্র্যের সমন্বয়েই তিনি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র আরেকটি বিশেষ গুণ ছিল—তিনি ভালো ছবি আঁকতেন। সাহিত্যের প্রতি যেমন তিনি শৈশব থেকে আগ্রহী ছিলেন, তেমনি স্কুলে পড়ার সময় থেকে ছবি আঁকা বা চিত্রশিল্পের দিকেও আগ্রহী ছিলেন। তাঁর চিত্রশিল্পের প্রতি আগ্রহ প্রথম প্রকাশ পায় ফেনী স্কুলে পড়ার সময়। স্কুলের হাতে লেখা ম্যাগাজিন 'ভোরের আলো'র সমস্ত অলংকরণ ও অঙ্গসজ্জা তিনি নিজের হাতে করেছেন। খুব যত্ন সহকারে আঁকা তাঁর সেই কর্ম দেখেই বোঝা গিয়েছিল তিনি চিত্রশিল্পের দিকে ঝুঁকছেন। কিন্তু অল্প বয়সেই সাহিত্যিক খ্যাতি না পেলে হয়তো তিনি চিত্রশিল্পীই হতেন। চিত্রশিল্পের প্রতি তাঁর আগ্রহ থেকেই পরবর্তীকালে চিত্রসমালোচনাও করেছেন 'স্টেটসম্যান'-এ। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন ও পটুয়া কামরুল হাসানের সাথে সখ্য গড়ে ওঠে তাঁর চিত্রশিল্পের আগ্রহের কারণেই। ওয়ালীউল্লাহ্ বেশকিছু ছবিও এঁকেছেন। কিন্তু বিভিন্নজনের কাছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার কারণে তাঁর ছবির কোনো প্রদর্শনী হয়নি।

চিত্রশিল্পী হিসেবে ওয়ালীউল্লাহ্র সবচেয়ে বড় নিদর্শন হলো তিনি তাঁর বেশ কয়েকটি বইয়ের প্রচ্ছদ নিজেই এঁকেছেন। যেসব বইয়ের প্রচ্ছদ তিনি নিজে এঁকেছেন সেগুলো হলো—'চাঁদের অমাবস্যা' (১৯৬৪), 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প' (১৯৬৫), 'কাঁদো নদী কাঁদো' (১৯৬৮), 'লালসালু'র ইংরেজি অনুবাদ 'Tree Without Roots'-এর প্রচ্ছদও তিনি নিজে এঁকেছেন। শৈশবে ছবি আঁকার স্বীকৃতিস্বরূপ পুরস্কারও পেয়েছেন তিনি। ওয়ালীউল্লাহ্র আরও একটি দুর্লভ গুণ হলো—তিনি ভালো কাঠখোদাই ও ভালো ছুতোর মিস্ত্রির কাজ জানতেন। নিজের ঘরদোরের টুকিটাকি আসবাবপত্র তিনি নিজের হাতে বানাতেন। তাঁর হাতের কাঠের কাজ দেখলে কেউ বিশ্বাসই করতে পারত না যে এ কোনো শৌখিন মিস্ত্রির কর্ম। জীবনকে, জীবনের পরিবেশকে, যতটা সম্ভব শিল্পিত করার প্রয়াসই ছিল ওয়ালীউল্লাহ্র একমাত্র সাধনা।

শৈশব থেকে শুরু করে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র জীবনের অনেকটা সময় কেটেছে তাঁর বড় মামা খানবাহাদুর সিরাজুল ইসলামের সান্নিধ্যে। তাঁর সাহিত্যজীবনের শুরুর প্রেরণা তিনি এই মামার কাছ থেকে পেয়েছেন। সিরাজুল ইসলাম ছিলেন একাধারে স্নাতকোত্তর ডিগ্রির অধিকারী ও আইনবিদ; আর চাকরিজীবনে তিনি ছিলেন আইন সচিব। তাঁর স্ত্রী সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র বড় মামী রাহাত আরা বেগম ছিলেন একজন খ্যাতিমান উর্দু লেখিকা ও রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী। তিনি উর্দুতে রবীন্দ্রনাথের 'নিশীথে' গল্প ছাড়াও 'ডাকঘর' (১৯১২) নাটক অনুবাদ করেন। রবীন্দ্রসাহিত্য ও বরীন্দ্রসংস্কৃতি পরিস্নাত মামাবাড়ির পরিবেশ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্কে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করেছিল সন্দেহ নেই।

সাহিত্যসাধনায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ছিলেন সিরিয়াস ধরনের একজন লেখক। কোনো গল্প বা উপন্যাস লিখেই তিনি প্রকাশের দিকে মনোযোগ দিতেন না। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'লালসালু' লেখার পর তিনি তা বন্ধুদের পড়ে শোনাতেন। কেউ বিরূপ সমালোচনা করলে এবং সে সমালোচনা যদি তিনি নিজে মনে করতেন সঙ্গত, সঙ্গে সঙ্গে সে অংশ ছিঁড়ে ফেলতেন। আবার লিখতেন। অর্থাৎ লেখক হিসেবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ আত্মম্ভর ছিলেন না। অন্যের গঠনমূলক ও সঙ্গত সমালোচনার প্রতি তিনি ছিলেন সহিষ্ণু, শ্রদ্ধাশীল ও নমনীয় এবং প্রয়োজনে নিজের রচনার পাঠ-পরিবর্তনেও দ্বিধা করতেন না।

ওই সময়কার সেরা প্রকাশনা সংস্থা 'পূর্বাসা' থেকে বের হয় তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'নয়নচারা' (১৯৪৫)। পরবর্তীকালে ওয়ালীউল্লাহ্র মামার ও নিজের প্রকাশনা 'কমরেড পাবলিশার্স' থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম উপন্যাস 'লালসালু' (১৯৪৮)। নওরোজ কিতাবিস্তান প্রকাশ করে দ্বিতীয় উপন্যাস 'চাঁদের অমাবস্যা' (১৯৬৪), দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প' (১৯৬৫) ও তৃতীয় উপন্যাস 'কাঁদো নদী কাঁদো' (১৯৬৮)। প্রথম নাটক 'বহিপীর' বের হয় ১৯৬০ সালে। দ্বিতীয় নাটক 'তরঙ্গ-ভঙ্গ' প্রকাশ পায় ১৯৬৪ সালে। তৃতীয় ও সর্বশেষ নাটক 'উজানে মৃত্যু' প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালে বাংলা একাডেমি থেকে। এছাড়া জনাব কলিমুল্লাহ কর্তৃক 'লালসালু'র উর্দু অনুবাদ 'Lal Shalu' প্রকাশ পায় ১৯৬০ সালে। এ্যান মারি থিবো ১৯৬১ সালে 'L' Arbe sans raciness' নামে 'লালসালু'র ফরাসি অনুবাদ করেন। এবং 'লালসালু'র ইংরেজি অনুবাদ 'Tree Without Roots' প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সালে। উল্লেখ্য, 'লালসালু'র জার্মান ও চেক অনুবাদও বের হয়েছে। শিবনারায়ণ রায়ের মতে, প্রথম যুগের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরে যিনি বাংলা ভাষায় সম্ভবত সবচাইতে মৌলিক ও প্রতিভাবান ঔপন্যাসিক তিনি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্। ওয়ালীউল্লাহ্র তিনটি উপন্যাস বেশ আলোড়িত হওয়ায় তাঁর ছোটগল্পগুলোর কীর্তি তেমন চোখে পড়ে না। বস্তুত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ছোটগল্পে নিজেকে উপস্থাপন করেছেন ভিন্ন রকমের এক ব্যক্তি হিসেবে। তাঁর গল্পের বিষয়বস্তুর পরিধি বিস্তৃত নয়, বরং অল্প কয়েকটি ছাড়া মধ্যবিত্তের সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ। কিন্তু শিল্পী হিসেবে তিনি স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। তাঁর ছোটগল্পে ব্যক্তি ও সমাজ খুব ঘনিষ্ঠভাবেই উপস্থাপিত হয়েছে। তাঁর ভাষাও নিজস্ব-চিহ্নিত; কারো থেকে ধার করা নয়। সমাজের বিভিন্ন সমস্যার মতোই ব্যক্তির অন্তর্জগতের সমস্যাও উপেক্ষণীয় নয়। ওয়ালীউল্লাহ্ ব্যক্তির সেই অন্তঃপুরের ছবি আঁকতে চেয়েছেন তাঁর উপন্যাসের মতো ছোটগল্পেও। যদিও অকালমৃত্যুর কারণে তাঁর কাজের পরিমাণ বিপুল নয়, কিন্তু কাজের গুণে তিনি সমগ্র বাংলা ছোটগল্পকে সাহিত্যের একটি বড় বিষয়বস্তুতে রূপান্তরিত করেছেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র প্রথম উপন্যাস 'লালসালু' একটি অসামান্য গ্রন্থ। দেশ-বিদেশে বাংলা কথাসাহিত্যের এক বিরাট মাইলফলক হিসেবে কাজ করে।

১৯৬৭ সালে ইউনেস্কোতে 'প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট' হিসেবে যোগদানের পর থেকেই পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র মতান্তর শুরু হয়, যা ক্রমান্বয়ে এক সম্মুখ বিরোধে রূপ নেয়। ইউনেস্কোর কোটা অনুযায়ী পাকিস্তান থেকে যখন একজনের জন্য চাকরি নির্ধারিত ছিল ওই পদে, তখন পশ্চিম পাকিস্তান থেকেই সে পদে নিযুক্ত হবার কথা। একারণেই বাঙালি-বিদ্বেষী পাকিস্তান সরকার তাঁর চাকরি অনুমোদন করেনি। এ-সময় পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত ছিলেন জনৈক পাঞ্জাবি। তিনি ছিলেন ঘোরতর বাঙালি-বিরোধী। সরকারের নির্দেশ অনুসারে তিনি ওয়ালীউল্লাহ্র চাকরিচ্যুতির ব্যাপারে ইউনেস্কোর সঙ্গে সক্রিয় যোগাযোগ করতে থাকে। একপর্যায়ে এমন হুমকিও প্রদান করা হয়েছিল যে, ওয়ালীউল্লাহ্কে দূতাবাসে ফেরত না পাঠালে পাকিস্তান ইউনেস্কো থেকে বেরিয়ে আসবে। গত্যন্তর না দেখে, বিশেষ করে একজন ব্যক্তির জন্যে একটি রাষ্ট্রের সঙ্গে সংঘাত অবাঞ্ছিত বিবেচনা করে ইউনেস্কো ওয়ালীউল্লাহ্কে ব্যাংককে স্থানান্তরের প্রস্তাব দেয়; যা তাঁর জন্য ছিল আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত। এমতাবস্থায় ব্যাংককে যেতে অস্বীকৃতি জানালে ইউনেস্কোতে ওয়ালীউল্লাহ্র কর্মকাল শেষ হয়েছে বলে তাঁকে চাকরিচ্যুত করা হয়। তিনি আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা দায়ের করেন ইউনেস্কোর বিরুদ্ধে। পাকিস্তানিদের চক্রান্তে মামলার রায় তাঁর বিপক্ষে যায় এবং তিনি চাকরি হারান। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি ছিলেন বেকার। তারপরও যখন পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানিদের আক্রমণ শুরু হয় তিনি সেখান থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে দাঁড়ান। নিজের স্বল্প উপার্জন থেকে যখন যেটুকু সম্ভব কলকাতায় মুক্তিযুদ্ধ তহবিলে পাঠাতেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্। বর্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে প্রতিদিন অসংখ্য স্বদেশির মৃত্যুর সংবাদে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র মানসিক উদ্বেগ, উত্তেজনা তীব্ররূপ ধারণ করে; তিনি আক্রান্ত হন হাইপার টেনশনে। বেশ কিছুকাল ধরে ডায়াবেটিসের রোগী থাকায় তাঁর আর সুস্থ অবস্থায় ফেরত আসা হয়নি। ১৯৭১ সালের ১০ অক্টোবর মধ্যরাতে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত কারণে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

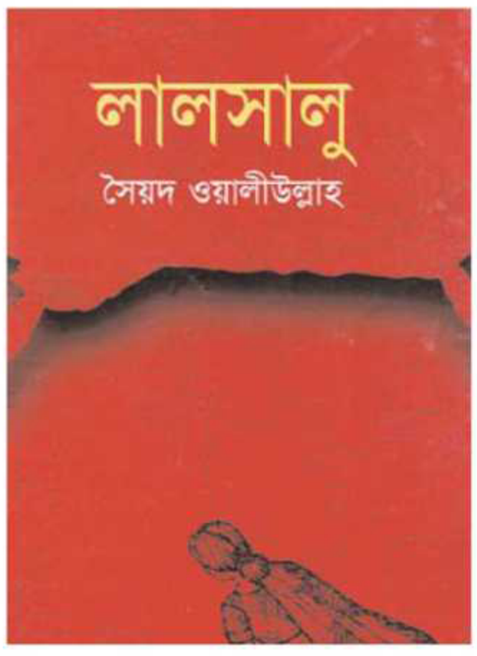

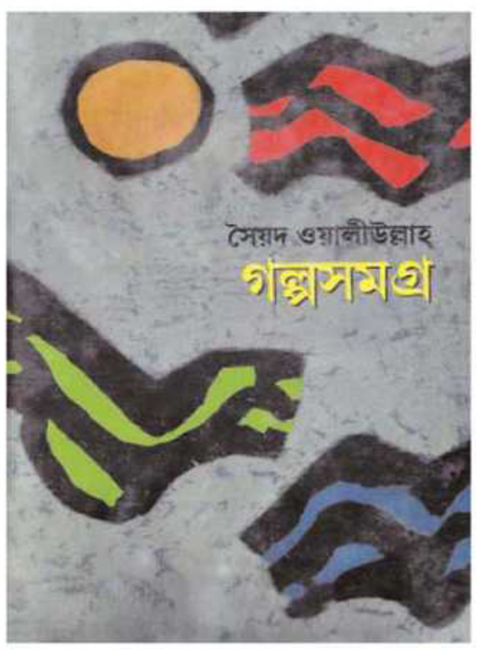

কৃতজ্ঞতা : গুণীজনডটকম